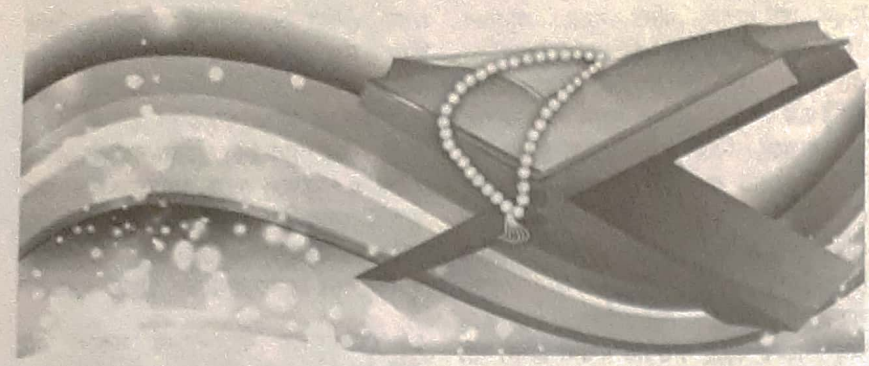

রাসূল (সা:) এর শিক্ষা ব্যবস্থা ও বর্তমান শিক্ষিত সমাজ

মোঃ মাসুম বিল্লাহ আল-আযহারী

> রাসূলুল্লাহ (সা:) সৃষ্টি জগতের কারো ছাত্র ছিলেন না। তিনি কোনো মানবতার কাছ থেকে শিক্ষার হাতেখড়ি নেন নি। বরং তিনি বিশ্বমানবতার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তায়ালা হলেন মহান শিক্ষক আর মুহাম্মাদ (সা:) তাঁর সুযোগ্য ছাত্র।

মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অক্সিজেনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একটি বাচ্চা ভূমিষ্ঠের পরে এ দুনিয়ায় অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকতে সমান্তরালে দু'টি জিনিসের উপর ভর করতে হয়, অক্সিজেন ও শিক্ষা। ধরুন একটি শিশু ভূমিষ্ঠের পরে ঠিকভাবে অক্সিজেন পাচ্ছে কিন্তু কিভাবে মাতৃস্তন থেকে খাবার গ্রহণ করতে হবে তা সৃষ্টিগতভাবে জানে না বা শিখার কোন আগ্রহ তার ভেতরে নেই, এমতাবস্থায় তার বেঁচে থাকা পুরোপুরি অনিশ্চিত। এজন্যে "আল্লাহ তায়ালা প্রথম মহামানব আদম (আ:) কে তৈরি করেই তাকে সবকিছু শিক্ষা দিলেন" (আল-বাকারাহ: ৩১) শিক্ষার দু'টি পার্শ্বক্রিয়া আছে- পজিটিভ ও নেগাটিভ। ইসলাম যার নাম দিয়েছে উপকারী জ্ঞান এবং ক্ষতিকারক জ্ঞান। "হে আল্লাহ! আমাকে উপকারী জ্ঞান দেন" (শুয়াবুল ঈমান লিলবাইহাকী/১৬৪৫), "আল্লাহ! ক্ষতিকারক জ্ঞান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" (মুসলিম/৪৮৯৯)। সকল নবী-রাসূলের (সা:) মিশন ছিল উপকারী জ্ঞানকে ক্ষতিকারক জ্ঞান থেকে পার্থক্য করে সঠিক শিক্ষাকে মানবতার সামনে পেশ করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার আসল পরিচয় তুলে ধরা। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (সা:) তৎকালীন কলুষিত জাহেলি সমাজ, যেখানে ক্ষতিকারক জ্ঞানের জোয়ারে উপকারী জ্ঞান সমাজ থেকে ভেসে গিয়েছিল। সে জোয়ারকে উল্টে দিয়ে সমাজে উপকারী জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই ছিল যার আগমনের লক্ষ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে রাসূলের (সা:) শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

রাসূল (সা:)-এর শিক্ষাব্যবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি ধাপে আলোচনা করার মাধ্যমে প্রবন্ধটির ইতি টানবো। প্রথম ধাপে ছাত্র হিসেবে কেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা:), দ্বিতীয় ধাপে মানবতার শিক্ষক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এবং সর্বশেষ শিক্ষার মূল্যায়নে রাসূলুল্লাহ (সা)।

প্রথমত: ছাত্র হিসেবে কেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা:)। বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক কে ছাত্র বলে ভুল করলাম না তো? না! তিনি সৃষ্টি জগতের কারো ছাত্র ছিলেন না। তিনি কোনো মানবতার কাছ থেকে শিক্ষার হাতেখড়ি নেন নি। বরং তিনি বিশ্বমানবতার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তায়ালা হলেন মহান শিক্ষক আর মুহাম্মাদ (সা:) তাঁর সুযোগ্য ছাত্র। সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্ববাসীর জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত মাইলফলক হিসেবে থাকবে। ছাত্র হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল? তার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে-

১। নির্জনে জ্ঞান অন্বেষণ

পুরো আরব সমাজে ছিল অপশিক্ষা আর অপসংস্কৃতির সয়লাব। "জোর যার মুলুক তার" এ নীতি বিরাজ করছিল সে সমাজে। নারীদের কোন সামাজিক অবস্থান ছিল না, ভোগ্যপণ্য হিসেবে পরিগণিত হতো তারা। মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর কাতারে নেমে গিয়েছিল। আসল উপাস্যকে ছেড়ে পাথরের তৈরি মূর্তি, আগুন, গাছ-পালা এবং চন্দ্র-সূর্যকে উপাসনা করতে তাদের বিবেক একটু নাড়া দিত না। এমন এক কলুসিত সমাজে অবস্থান করা সত্ত্বেও কোন ধরনের কলুষতা মুহাম্মাদ (সা:) কে স্পর্শ করতে পারেনি। বরং সমাজে বিরাজমান অপশিক্ষাকে কিভাবে সুশিক্ষা দিয়ে পরিবর্তন করা যায়, তার জন্যে পরিকল্পনা আঁটতেন নীরবে নিবৃত্তে। গবেষণার জন্যে খুঁজছিলেন এমন এক নীরব স্থান, যেখানে সমাজে বিরাজমান কলুষতার ছোঁয়া পায়নি, মিলবে এমন এক সত্তার সন্ধান, যার হাতে সকল শিক্ষার ভান্ডার, আদায় করে নেয়া যাবে সমাজ সংস্কারের এক কার্যকরী সমাধান। মক্কা থেকে তিন কিঃ মিঃ দূরের নুর পাহাড়ে অবস্থিত "হেরা গুহা" কে নির্বাচিত করলেন ব্যক্তিগত গবেষণাগার হিসেবে। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর গবেষণার পাশাপাশি এক অদৃশ্য শক্তির অপেক্ষা করছিলেন। তিন বছর এ অবস্থায় অতিবাহিত হলে, চল্লিশ বছর বয়সে হযরত জিব্রাইল (আঃ) মহাজ্ঞানী আল্লাহর তরফ থেকে সুশিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলেন (আল-বুখারী)। যোগ্য ছাত্র হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা:) এ বৈশিষ্ট্য থেকে বর্তমান ছাত্রসমাজের শিক্ষণীয় বিষয় হলো-

সমাজের প্রচলিত প্রথায় পরিতুষ্ট না হয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের মানদন্ডে সেটাকে

পরিমাপ করে সঠিক প্রমাণিত না হলে সত্যের সন্ধানে বের হওয়া প্রয়োজন।

১। গবেষণাভিত্তিক অধ্যয়ন করা:

কলুষিত সমাজকে সংস্কারের জন্যে নীরবে নিবৃত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, সঠিক ও দলীলভিত্তিক জ্ঞানের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

২। রাতের গভীরে অধ্যয়ন:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীবকে শিক্ষা গ্রহণ বা জ্ঞানার্জন করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- রাত্রের গভীরে, সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, ডিস্টার্ব করার কেউ থাকে না, এমন সময়ে অধ্যয়নে মনোযোগ দেয়া। একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নের সময়তো এটাই, কারণ এ সময় ব্রেইন ঝামেলামুক্ত ও ফ্রেশ থাকে, যা জ্ঞান ধারণের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) [المزمل: 1-6]

অর্থাৎ: "হে মুহাম্মাদ! রাত্রে অধ্যয়নের জন্য উঠে দাঁড়াও, কিছু অংশ বাদ দিয়ে, তার অর্ধেকাংশ অথবা তার চেয়ে আরো কিছু কম, কিংবা চাইলে আরো কিছু সময় বাড়িয়ে নিতে পার। আর তুমি থেমে থেমে গবেষণার সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর। অচিরেই তোমার উপর রবের একটি দায়িত্ব আসবে। অবশ্যই রাত্রের বিছানা ত্যাগ আত্মসংযমের জন্য বেশি কার্যকর পন্থা, তাছাড়া কুরআন পাঠেরও যথার্থ সুবিধা থাকে বেশি"। (আল-মুজ্জাম্মিল/১-৬)

মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা গবেষণা বা অধ্যয়নের জন্যে রাত্রের গভীরতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার রহস্য কি? এ ব্যাপারে সাধারণ বিজ্ঞানীরা তথ্য দিয়েছেন। আমেরিকার একদল গবেষক প্রমাণ করেছেন- "কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে গঠিত হয় মানবদেহ। প্রত্যেকটি কাজ সম্পন্নের জন্যে নির্দিষ্ট কোষ আছে। যেমন: হাঁটা-চলা, ধরা-ছোঁয়া, রাগ-ক্রোধ, স্নেহ-মমতা, ব্যবসায়ী হিসাব নিকাশ ইত্যাদি কাজের জন্যে সেগুলো সোচ্চার থাকে। রাতের গভীরে সকল কোষ বিশ্রামে থাকে। এ সময়ে যে কোন একটি কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে পারলে সকল কোষ একযোগে ঐ কাজে সহযোগিতা করে, যার কারণে কাজটি ব্রেইন অতি সহজে ধারণ করতে পারে।

বর্তমান ছাত্রসমাজে যে বিষয়টি বেশী পরিলক্ষিত হয় তা হলো- আল্লাহ তায়ালা যিনি মহাজ্ঞানী, জ্ঞানের চাবি যার হাতে, মহান দাতা, যাকে ইচ্ছা অঢেল দেন এবং যিনি সকল জ্ঞানের শেষ ঠিকানা এমন সত্তার সাথে সম্পর্ক খুবই দুর্বল। গভীর রাত্রে উঠে তাঁর কাছে ধর্না দিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। যার ফলে আজ আলিমে রাব্বানী নেই বললে ভুল হবে না। সমাজে প্রতিষ্ঠিত আলেমরা সত্য সন্ধানী নয়, ইসলামের নামে প্রচলিত প্রথাকেই তারা সঠিক ধরে নিয়েছে এবং জ্ঞানের সাথে দলিল চাওয়াটাকে তারা দোষের মনে করে। তাই আজকের ছাত্র সমাজের উপর আবশ্যক হলো- গভীর রাত্রে উঠে সুশিক্ষা বা সঠিক জ্ঞানের জন্যে আল্লাহর কাছে ধর্না দিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা। এর ফলে সেদিন দ্রুত ত্বরান্বিত হবে, যে দিন সত্যের আলোতে কুসংস্কারে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান সমাজ আলোকিত হবে। (ইনশাআল্লাহ)

৩। বছরে একবার রিভিশন:

মহান শিক্ষকের সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা:) আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো- সারা বছর যা শিখতেন তা রমাযান মাসে রিভাইস করতেন, যাতে অর্জিত জ্ঞানের কোন অংশ তার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত না হয়। ইমাম বুখারী (রহ:) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. [البخاري/5]

অর্থাৎ: "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) সবচেয়ে বেশি দানবীর ছিলেন। বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানের দরিয়ায় ঢেউ খেলত, যখন জিব্রিলের (আ:) সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি রমযানের প্রত্যেক রাত্রে জিব্রিলের (আ:) সাথে কুরআনের অবতারিত অংশ রিভাইস করতেন। ভালো কাজে তাঁর স্পৃহা ছিল ঝরের মতো। (আল-বুখারী/৫)

অর্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণের জন্য তিনি শুধু মুখস্থ করাকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং লিখে রাখার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন

كان النبى صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه شئ من الوحى يأمر كُتَّاب الوحى بكتابته فورًا، سماعًا من فمه الطاهر ثم ينشر ما نزل من الوحى بين الناس. [شبهة المشككين: 7]

অর্থাৎ: "রাসূলের (সা:) উপর প্রত্যাদেশ আসা মাত্রই অহি লেখকদেরকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন এবং তারা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুনে লিখতেন অতপর তিনি মানুষের কাছে পৌছাতেন। (শুবহাতুল মুশাক্কিকীন/৭)

আল্লাহর পথের ত্যাগী ছাত্রদের জন্যে শিক্ষণীয় দিক হলো- সারা বছরে অর্জিত জ্ঞান কে বছরে একবার রিভাইস করা। নুতন কোন জ্ঞান পাওয়া মাত্র নোট করে রাখা, যাতে ভুলে গেলে নোটবুক দেখে সংগ্রহ করে নিতে পারে। বিজ্ঞজন বলেন- القراءة صيد والكتابة قيد.

অর্থাৎ: "পড়া শিকারের শামিল আর তা লিখে রাখা খাঁচাবদ্ধ করারই নামান্তর"।

৪। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে শান্ত ও স্থির থাকার প্রশিক্ষণ:

রাসূল (সা:) নবুয়াতের প্রথম জীবনে অহি অবতীর্ণ কালে অধিক আগ্রহ ও ছুটে যাওয়ার আশংকায় মুখস্থ করার জন্যে খুব তাড়াহুড়া করার কারণে জিহবাকে খুব বেশি নাড়াচড়া করতেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে শান্ত ও স্থিরভাবে কুরআন মুখস্থ করার পরামর্শ দিলেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) [القيامة: 16-19]

অর্থাৎ: "হে নবী! অহির ব্যাপারে, তুমি তাতে তাড়াহুড়া করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহবা নাড়িওনা, এর একত্র করা ও ঠিকমতো পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। অতএব আমি জিব্রিলের মাধ্যমে তোমার কাছে যখন কুরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার দিকে মনোযোগ দাও এবং এর অনুসরণ করার চেষ্টা করো। অতঃপর তোমাকে এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার উপর"। (আল-কিয়ামাহ/১৬-১৯)

আল্লাহ তায়ালার এ বাণী তাঁর সুযোগ্য ছাত্র মুহাম্মাদ (সা:) এর জন্যে পরামর্শ হলেও বিশ্বমানবতার জন্যে এক চিরন্তন নির্দেশ। কাজেই একজন ছাত্রের কর্তব্য হলো-

অধ্যয়নের জন্যে নিজেকে শান্ত ও স্থিরভাবে প্রস্তুত রাখা।

৫। মহাজ্ঞানীর কাছে জ্ঞান প্রার্থনা:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব মুহাম্মাদকে (সা:) স্বয়ং তাঁর কাছেই জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। কুরআনে এসেছে-

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا. [طه: 114]

অর্থাৎ: "হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেন" (ত্বহা/১১৪)।

ইমাম তিরমিযী (রহ:) তার সুনানে উল্লেখ করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. [الترمذي: 3599]

অর্থাৎ: "হযরত আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (সা:) সর্বদা বলতেন: আল্লাহ আমাকে যা শিখিয়েছেন তার থেকে উপকার নেয়ার তাওফিক দেন, আমাকে তাই শিক্ষা দেন যা আমার জন্য উপকারী এবং আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দেন। আমি সর্বাবস্থায় আপনারই প্রশংসা করি" (আত-তিরমিযী/৩৫৯৯)। ছাত্র সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের করণীয় হলো- রাসূলুল্লাহর (সা:) মতো আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বদা সুশিক্ষা প্রার্থনা করা। রাসূলের (সা:) ছাত্রত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন আদর্শ ছাত্রের বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত? তার সংক্ষিপ্ত চিত্র-

সমাজের প্রচলিত প্রথায় পরিতুষ্ট না হয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের মানদন্ডে সেটাকে পরিমাপ করে সঠিক প্রমাণিত না হলে সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া গবেষণাভিত্তিক অধ্যয়ন করা। কলুষিত সমাজকে সংস্কারের জন্যে নীরবে নিবৃত্তে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। সঠিক ও দলীলভিত্তিক জ্ঞানের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। গভীর রাত্রে উঠে সুশিক্ষা বা সঠিক জ্ঞানের জন্যে আল্লাহর কাছে ধর্না দিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা। সারা বছরে অর্জিত জ্ঞানকে বছরে একবার রিভাইস করা নুতন কোন জ্ঞান পাওয়া মাত্র নোট করে রাখা, যাতে ভুলে গেলে নোটবুক দেখে সংগ্রহ করে নিতে পারে। অধ্যয়নের জন্য নিজেকে শান্ত ও স্থিরভাবে প্রস্তুত রাখা।

(চলবে)...

মুমিনের জীবন

মু. মশিউর রহমান

পৃথিবীটা নয়তো মুমিনের জন্য
ফুল বিছানো পথ,
বাঁকে বাঁকে থাকে সেথা
কাঁটা আর যন্ত্রনা
তবু সে খোজে নাকো
ভিন্ন কোন মত।

এ পথ কখনো রবির কিরণে
উত্তপ্ত এক মরু
এ পথ কখনো গরম পাথরের
আঘাত সহে শুরু
এ পথে কখনো গরম কড়াইয়ে
নিজেকে সপতে হয়
এ পথে কখনো গায়ের রক্তে
আগুন নিভাতে হয়
এ পথে কখনো পাথরের আঘাতে
রক্ত জমিনে ঝরে
এ পথে কখনো শাহাদাত এসে
বুকে আলিঙ্গন করে
লোহার চিরুনি কখনো আবার
হাড় থেকে ছিড়ে খায় দেহের গোশত সব
তবু সে খোজে নাকো
ভিন্ন কোন মত।

এ পথে থাকে বন্ধি জীবন
স্বাধীনতা নেয় কেড়ে
এ পথে থাকে ক্ষুধার যন্ত্রনা
জীবন প্রদ্বীপ নিভে
এ পথে যায় শুনা যায়
মাজলুমানের আর্তনাদ
হাত-পা কিংবা চোখ হারা
অজস্র ভায়ের বিলাপ
এ পথে যায় শুনা যায়
দুখিনী মায়ের কান্না
নাড়ি ছেড়া ধন বুকের মানিক
সেতো আর ফিরবে না
সাদা কাগজে লাল কালিতে
যেন লিখে গেল সে
মাগো-মা দু:খ করো না
তোমার সাথে আমার আবার দেখা হবে
জান্নাতের সিঁড়িতে
এ পথে কখনো ফাঁসির মঞ্চে
হাসি মুখে হেটে যেতে হয়
শহীদি মিছিলে শরীক হয়ে
বিপ্লবী গান গাই ।